অহিংস নীতি: গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের কার্যক্রমের উপর একটি পর্যালোচনা

ফারজানা হোসেন*

সারসংক্ষেপ: মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি কেবল একটি নৈতিক আদর্শ নয়, এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল এবং পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত নিরাময়ে মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালী শান্তি মিশন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অহিংস নীতির সবচেয়ে বড় প্রয়োগ। এই মিশনকে কেন্দ্র করেই নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলায় গড়ে উঠে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট। এই প্রবন্ধে অহিংস নীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং নোয়াখালী গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের অহিংস নীতি ভিত্তিক বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট নোয়াখালী জেলা ছাড়াও লক্ষীপুর, ফেনী, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট মহাত্মা গান্ধীর দর্শন ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অহিংস দর্শনের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসনে কাজ করছে এবং এসব কার্যক্রমকে জনসম্মুখে তুলে ধরছে। বর্তমান গবেষণায় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর রচনাবলী, গান্ধী দর্শন সম্পর্কিত গবেষকদের প্রবন্ধ, গ্রন্থ, গবেষণা রিপোর্ট, বাংলাপিডিয়া, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে ট্রাস্টের লক্ষ্যভূক্ত জনসমষ্টির উপর পরিচালিত গবেষণার তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, ট্রাস্টের কর্ম এলাকায় অহিংস নীতিভিত্তিক কর্মসূচী পরিচালনার ফলে লক্ষ্যভুক্ত জনসমষ্টির জীবনের সমস্যা মোকাবেলার কৌশল পরিবর্তন হয়েছে। ট্রাস্টটি ১৯৯৪ সাল থেকে ২৭ হাজারের বেশি পারিবারিক সহিংসতা মামলা সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করেছে এবং বৃহত্তর নোয়াখালীর তিনটি জেলায় ২৫ হাজার দরিদ্র পরিবারের সাথে কাজ করছে। অহিংস নীতির চর্চা লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সংকট নিরসনে, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব দূরীকরণে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। গান্ধীর অহিংস নীতি একটি শক্তিশালী এবং প্রাসঙ্গিক ধারণা, যা বর্তমান সময়েও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মূলশব্দ: অহিংসা, সত্যাগ্রহ, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট, নোয়াখালী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গ্রামীণ উন্নয়ন।

ভূমিকা:

অহিংস নীতি একটি প্রাচীন ধারনা। ভারতের জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারত স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এই নীতিকে নতুনভাবে বিশ্বরাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যে সময় ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসেন সেসময় পরাধীন ভারতবর্ষ নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় নিমজ্জিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় একুশ বছর শোষণের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি খুব সহজেই ভারতীয় রাজনীতিতে এসে সঠিক, বাস্তবমুখী ও প্রয়োগযোগ্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে সক্ষম হন। গান্ধীর বিশুদ্ধ ও মানবিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল প্রচলিত রাজনৈতিক ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ

*ড. ফারজানা হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক. রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা, বাংলাদেশ

আলাদা[১]। তিনি মানুষের আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির দীক্ষা দেন। গান্ধী সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তাদের ধর্মীয় অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঔপনিবেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করার জন্য চলমান নানাবিধ সহিংস আন্দোলনের সামনে তিনি অহিংস আন্দোলন নিয়ে আসেন। শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে প্রচলন করেন হরতাল, সত্যাগ্রহ, অনশনের মত অহিংস কর্মসূচী[২]। গান্ধীর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল সত্যের অনুসন্ধান ও তার প্রয়োগ। অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত হন এবং ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী হিসেবে পরিচিত হন। মহাত্মা গান্ধী অহিংসা নীতিকে নিছক নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেননি বরং তিনি একে অনুকরণযোগ্য জীবনপদ্ধতি বলে মনে করেন। অহিংস পদ্ধতির কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষতার পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। অহিংস সত্যাগ্রহকে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে গান্ধী প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলি ছিল এই নীতির পরীক্ষাগার। মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্দা আশ্রম থেকে ভারতবর্ষের গোটা জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতেন। গান্ধী তার অনুসারীদের স্থানীয় পর্যায়ে আশ্রম তৈরীর মাধ্যমে গান্ধীর আদর্শ অনুশীলন করার পরামর্শ দেন। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবার প্রাক্কালে ধর্মভিত্তিক দেশভাগকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত ভারতে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ইতিহাসের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সেই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ক্ষত নিরসনের জন্য এবং জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ৭৭ বছর বয়সে মহাত্মা গান্ধী অবিভক্ত ভারতের দাঙ্গা কবলিত স্থান ভ্রমণ করেন। নোয়াখালীতে গান্ধীর এই যাত্রা শুরু হয় এবং বিহার পরিদর্শন শেষে দিল্লীতে তার জীবনাবসানের মাধ্যমে এই মিশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। গান্ধী নভেম্বর ১৯৪৬ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ পর্যন্ত চার মাস নোয়াখালীতে অবস্থান করেন। গান্ধী এই সময়কালে দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালীর ৪৭টি গ্রাম পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করেন এবং গ্রামীণ জনগণকে অহিংস নীতির দর্শন দ্বারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তার এই ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলায় অবস্থিত গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পটভূমি রচিত হয়। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট বাংলাদেশের একটি জনকল্যাণমূখী, অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। এটি মহাত্মা গান্ধীর সত্য ও অহিংসা, শান্তি ও সম্প্রীতির মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করছে। দাঙ্গা কবলিত নোয়াখালী ভ্রমণকালে গান্ধী জয়াগ গ্রামে পৌঁছালে জয়াগ নিবাসী ব্যারিস্টার হেমন্ত কুমার ঘোষ তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি 'অম্বিকা কালীগঙ্গা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীকে দান করেন যেন গান্ধী এই সম্পত্তি দ্বারা এলাকার উন্নয়ন ঘটাতে এবং শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। ট্রাস্টের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয় ১৯৪৯ সালে। গান্ধীর মতাদর্শ দিয়ে গড়ে ওঠা এ প্রতিষ্ঠান শুরু থেকে এতদ্বঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষতঃ নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠান শুরু থেকেই দু'টি এ্যাপ্রোচের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে। একটি হচ্ছে উন্নয়নমূলক এবং অপরটি হচ্ছে দাতব্য সেবামূলক কার্যক্রম[৩]। প্রতিষ্ঠার পর এই প্রতিষ্ঠান দাতব্য কার্যক্রমের পাশাপাশি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পূণর্বাসনের জন্য আবাসন ও খাদ্য সংকট মেটানোর এবং সমগ্র এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদার করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত এসকল কার্যক্রম চালু ছিল[৪]। পাকিস্তান শাসনামলে এর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে এবং আশ্রমের বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশই বেদখল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আবার শুরু হয় এবং সম্পত্তি পুনরায় দখলের মাধ্যমে ট্রাস্টটি পূনর্গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২ অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশ সরকারের গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে "অম্বিকা কালিগঙ্গা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট" এর নামকরণ করা হয় "গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট"[৫]। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী কমিটি দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বর্তমানে আশ্রমটি পরিচালনায় পুরানো আইন রহিত

করে 'গান্ধী আশ্রম (ট্রাস্টি বোর্ড) আইন, ২০২১' অনুযায়ী আশ্রমটি পরিচালিত হচ্ছে[৬]। এই আইন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান ও ছয় জন ট্রাস্টির সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গান্ধী আশ্রমের সমস্ত কার্যাবলী পরিচালনা করছে।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের মূল লক্ষ্য হল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, যেন তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার পাশাপাশি জীবনের যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট তার আওতাভূক্ত এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের কল্যাণে এমনভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে যাতে করে সকল সম্প্রদায়ের লোক বিশেষভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী শান্তি, অহিংসা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে জীবনধারণের উপযোগী সকল অধিকার ও সুযোগসুবিধা অর্জনে সক্ষম হয়[৭]। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের বর্তমান কর্মএলাকা নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা এই চারটি জেলা ছাড়াও চাঁদপুর জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। ট্রাস্ট গান্ধীর আদর্শ প্রচার এবং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী ও সমমনা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কর্মএলাকার বাইরেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ট্রাস্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতার প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু সমৃদ্ধি মানুষের আত্মিক উন্নতিকে নিশ্চিত করে না। ফলে বিশ্বব্যাপী দেখা দিচ্ছে বহুমাত্রিক সংকট। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশে যুদ্ধ, সহিংসতা, সামাজিক অস্থিরতা ও নানাবিধ বৈষম্য দেখা যায়। বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক সংকটের পাশাপাশি পারস্পরিক অবিশ্বাস, নীতিহীনতা, নৈতিকতার অবক্ষয় ইত্যাদি সমস্যার কারণে বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা মোকাবেলা করছে। যেমন: দূর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন, লুটপাট, যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকান্ড ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির চর্চার মাধ্যমে সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

অহিংস নীতি:

অহিংস নীতি গান্ধী দর্শনের মূল চালিকা শক্তি। মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করে গান্ধী অহিংসার গতি ও উদ্দেশ্যের সন্ধান পেয়েছেন। যে সময় থেকে মানব সভ্যতার লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, মানুষ ক্রমান্বয়ে অহিংসার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সকল ধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি অহিংসার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূলভিত্তি অহিংসার বাণী তাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বেদ, ভগবতগীতা, বাইবেল ও কোরআন প্রভৃতি মহান ধর্মগ্রন্থ থেকে তিনি মানব জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধানের নির্দেশনা খুঁজে পান। তাছাড়া গান্ধী টলস্টয়, রাস্কিন, থোরো, মাৎসিনি, কার্পেন্টার প্রভৃতি পশ্চিমা দার্শনিক ও সংস্কারকদের লেখনী এবং দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন[৮]। বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও মনীষীর মতাদর্শ ও ধ্যানধারণাকে গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে অহিংস পথ অবলম্বনকে সকল প্রকার সমস্যার যথার্থ সমাধানের পথ হিসেবে চিহ্নিত করেন। অহিংসা হলো চূড়ান্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক। প্রকৃত অহিংসা প্রবল শক্তির প্রতীক। গান্ধীর অহিংস নীতি ছিল ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের হাতিয়ার। এই অহিংস নীতি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের অবশ্য কর্তব্য পালনের কর্মপ্রক্রিয়ারও একটি নিয়ম। গান্ধী দর্শনের আরেকটি অবদান সত্যাগ্রহ নীতি। গান্ধীর মতে, সত্যের অক্লান্ত অনুসন্ধান এবং সত্যে উপনীত হওয়ার সংকল্পই সত্যাগ্রহ। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম অহিংস প্রতিরোধের সূচনা করেন। সত্যাগ্রহ হলো জীবনের সমস্ত অশুভ শক্তি, অন্যায় এবং অসত্যকে ভালবাসা, আত্মশুদ্ধি, স্বেচ্ছাকষ্ট স্বীকারের মানসিকতা দিয়ে জয় করা[৯]। অহিংসার চরম প্রয়োগের ফলাফল তেমনভাবে দৃশ্যমান নাও হতে পারে তবে এর প্রয়োগ নিঃশব্দে অদৃশ্যভাবে সমস্ত সমাজকে আলোড়িত করতে সক্ষম। অহিংসার চর্চা ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে অহিংসার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে সঠিক ও সফল নেতৃত্বের গুণাবলীর উপর।

অহিংসার আক্ষরিক অর্থ অন্যকে হিংসা না করা বা কারও ক্ষতি না করা। অর্থাৎ কোন কাজে হিংসার বা নেতিবাচক ধারণার অনুপস্থিতিকে অহিংসা বলে। গান্ধীর মতে অহিংসার সংকীর্ণ অর্থ হলো কাউকে আঘাত না করা। অহিংস নীতি যেকোন অশুভ চিন্তা, মিথ্যা, ঘৃণা, কিংবা কোন প্রকার অনিষ্ট চিন্তা দ্বারাও লঙ্ঘিত হতে পারে[১০]। কিন্তু ব্যাপক অর্থে অহিংসা একটি ইতিবাচক ধারণা। অহিংসা মানে বিশ্বজনীন প্রেম, এর অর্থ হলো অপরের কল্যাণ সাধন করা, সকলের জন্য সক্রিয়ভাবে কল্যাণ কামনা করা। অহিংসার উদ্দেশ্য হলো প্রতিপক্ষকে ভালবাসা ও ভালবেসে তাঁর হৃদয় জয় করা। শুধু ভালবাসার জবাবে ভালবাসা নয় বরং যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদেরকে ভালবাসার মাধ্যমেই অহিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

গান্ধীর মতে, অহিংসা অতুলনীয় শক্তিশালী একটি অস্ত্র। অহিংসা কোন দূর্বল ব্যক্তির হাতিয়ার নয়, এটি হলো সবলের অস্ত্র এবং বীরোচিত আত্মার স্থির সংকল্প শক্তির অভিব্যক্তি। অহিংস পদ্ধতি কোন পরোক্ষ বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পদ্ধতি নয়, বরং এটি এমন একটি প্রতিরোধ পদ্ধতি যাতে হিংস্র পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না[১১]। সত্য ও নির্ভয়তা অপরিহার্যভাবে এই সক্রিয় অহিংসার অন্তর্ভূক্ত। ভীতু ব্যক্তিরা মৃত্যুভয় জয় করতে পারেনা তাই তারা সাধারণত অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে তার জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শুধুমাত্র সত্যাশ্রয়ী, সাহসী ও আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তিরাই অহিংসার অনুসারী হতে পারে এবং অহিংস পথের যাবতীয় প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে পারে। অহিংসা অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে ক্রমাগত নিজস্ব চরিত্র সংশোধন করতে হয়। অহিংস দর্শন অনুযায়ী, ব্যক্তি তার জীবনকে যতই অন্যের হাতে ছেড়ে রাখে ততই তার জীবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা বলতে গিয়ে গান্ধী বলেন, অহিংস প্রতিরোধই সর্বোৎকৃষ্ট। কোন কিছুর ভয়ে ভীত হয়ে আনুগত্য প্রদর্শনকে তিনি নিকৃষ্ট বলেছেন। এক্ষেত্রে হিংসাত্মক প্রতিরোধই শ্রেয়।

অহিংসা মানুষের আত্মিক শক্তি, কিংবা বলা যায় আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি ও সভ্য মানুষের হাতিয়ার। এটা মানুষ ও পশুর মধ্যকার পার্থক্য চিহ্নিত করে। হিংসা হলো পশুশক্তির প্রকাশ এবং অসভ্য মানুষের হাতিয়ার। গান্ধী বিশ্বাস করতেন মানুষের নীতিবোধ এবং যৌক্তিকতাবোধ তাকে পশু সত্ত্বা থেকে পৃথক করে দেয়। ব্যক্তির মনুষ্যত্ব জাগ্রত হলে তার পক্ষে হিংস্রতা অবলম্বন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে[১২]। মানবজাতির ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করে গান্ধী বলেন মানুষ সভ্যতা অর্জনের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে হিংসা পরিত্যাগ করে অহিংসার পথে অগ্রসর হয়েছে। মানুষের অধিকারভূক্ত শক্তিসমূহের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠতম শক্তি।

সত্য ও অহিংসা পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গান্ধীর মতানুসারে সত্যের মধ্যে অহিংসা আছে এবং সত্যই ভগবান। সত্য ও অহিংসা উভয়ই গান্ধীর কাছে ঈশ্বরতুল্য। আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ধার্মিক ব্যক্তির কাছে অহিংসার আদর্শ হলো ঈশ্বরীয় নির্দেশ। আমরা যদি সত্য ও অহিংসার সূত্রকে জীবনের সূত্রে পরিণত করতে বদ্ধ পরিকর হই তাহলে সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি অহিংসা।

হিংসা প্রতিপক্ষের মনে আরও বেশী প্রতিহিংসার জন্ম দেয় তাই হিংসাত্মক প্রতিরোধে বা প্রতিবাদে হিংসা-প্রতিহিংসার কখনও অবসান ঘটবে না। অহিংসা দিয়েই এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব। অহিংস নীতির নতুন মনস্তত্ত্বের মূলনীতি হচ্ছে, ঘৃণা ঘৃণার জন্ম দেয় এবং ভালবাসা ভালবাসার জন্ম দেয়। তাই

অহিংসা নীতির মাধ্যমে মানুষের বিবেকের কাছে এবং সুকুমার বৃত্তিসমূহের কাছে আবেদন জানানো হয়। ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তির ওপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি করা হয় না। এভাবে প্রতিপক্ষের মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, বিবাদমান দুটি গ্রুপের মধ্যে একপক্ষের পরাজয়ের মাধ্যমে অপরপক্ষের বিজয় অর্জিত হলে যে কোন দ্বন্দ্ব নিরসন হয়। কিন্তু অহিংস নীতির সত্যাগ্রহ পদ্ধতিতে দ্বন্দ্বের কারণ নির্মূলের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের পথ দেখানো হয়, ফলে বিবাদমান ব্যক্তি বা গ্রুপের মধ্যে জয়-পরাজয়ের বিষয় থাকেনা[১৩]।

অহিংসা হলো প্রেম-প্রীতির প্রকাশ। স্বভাবতই অহিংসা হিংসা থেকে উন্নত। অহিংস আদর্শের অনুগামী ব্যক্তি প্রতিপক্ষের ওপর শাস্তিমূলক কষ্ট চাপিয়ে না দিয়ে, নিজেই শাস্তি ভোগ করে। অহিংস ব্যক্তি আত্মোৎসর্গ করে ন্যায়ের পথে লড়াই করে। এ কারণে অহিংস নীতির অনুগামী হয়ে কোন যুদ্ধ হলে বাদী এবং বিবাদী উভয়ই নৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়। গান্ধী এ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রতিশোধ অপেক্ষা ভালোবাসার, হিংসা অপেক্ষা অহিংসার শক্তি বেশি। অন্যায়কে যদি আমরা না মানি, শাস্তির ভয়ে, মারের ভয়ে এমনকি প্রাণের ভয়েও ভীত না হয়ে যদি অন্যায়কে প্রতিরোধ করি তাহলে অন্যায় ধ্বংস হবেই। অন্যায়কারীকে মারবার কোন দরকার নেই"[১৪]।

অহিংস নীতি অনুসারে মানুষকে হিংসামূলক আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ অহিংসা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। গান্ধীর মতানুসারে, কখনও কখনও অহিংসা প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা বৃহত্তর অহিংসার স্বার্থে সহিংসতার আশ্রয় নিতে হয়। জীবন রক্ষার জন্য, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য, খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য, আঘাত, মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। জীবন বাচাঁনোর জন্য বিষধর সাপ বা পাগলা কুকুরের মৃত্যু ঘটানো, খাদ্যশস্য ধ্বংসকারী প্রাণীর মৃত্যু ঘটানো অহিংসা বিরোধী আচরণ নয়। তেমনি আবার আশ্রয় প্রার্থীর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে অনন্যোপায় হয়ে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণের আশ্রয় নিতে হতে পারে। নিজের জীবন ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই রয়েছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সত্য বৃহত্তর পরিসরে রাষ্ট্রের বা জাতির ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে সত্য। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক দেশ ও জাতির রয়েছে। গান্ধী সকলকে অহিংসা ও সত্যের জন্য সতত সচেষ্ট থাকতে বলেছেন এবং আপেক্ষিকভাবে উন্নত ধারণা হিসাবে অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অহিংসা হলো হিংসাকে পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টা। মানুষের সুস্থ্য সমাজজীবনের স্বার্থে এটা অপরিহার্য। তবে অহিংসার আচরণ হবে স্বতঃস্ফূর্ত, সমবেদনাযুক্ত এবং সর্বদা সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। এটি জনসাধারণের কাজকর্মের সফল কার্যপ্রক্রিয়া। হিংসার ন্যায় অহিংসার আদর্শও ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংগঠিত হতে পারে। মানবকল্যাণের ধারণা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রেরণা মহাত্মা গান্ধীকে অহিংসার পথ ও নীতি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নীরিক্ষা চালানোর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। গান্ধীর অহিংসার দর্শনের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। গান্ধী শিশুর সামাজিক ও অহিংসাবোধ বিকাশের স্বার্থে সমাজকেন্দ্রীক সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

অহিংসা পদ্ধতির জন্য কঠিন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস ঐ প্রশিক্ষণের প্রথম অপরিহার্য উপাদান। ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে কোন অসৎ কাজ করবেনা। অহিংসা কোন নীরব বা নির্জীব মতবাদ নয়, এটি জীবনদায়ী শক্তি এবং এজন্য একে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম বলা হয়েছে। অহিংসার ধারণাকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে তার প্রক্রিয়া মন থেকেই শুরু করতে হবে। অহিংস মানসিক অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট

শ্রম সাধ্য অভ্যাসের প্রয়োজন। সৈনিকের মতো নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে হবে। অহিংস ব্যক্তিকে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনাসমূহে অহিংস আচরণ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করতে হবে। অহিংসা শেখার সর্বোত্তম বিদ্যালয় হলো পারিবারিক পরিবেশ। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহিংস আচরণের চর্চা বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের অভ্যাস তৈরী করবে। পারিবারিক অহিংস পরিবেশে বেড়ে উঠা ব্যক্তির নিকট সমস্ত বিশ্বই তার পরিবার। তিনি কাউকে ভয় করবেন না এবং অন্যরাও তাকে ভয় করবে না।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন অহিংসার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তেমনি জাতিকেও অনুরূপ প্রশিক্ষণে শিক্ষিত করা জরুরী। গান্ধী বলেন, অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণহীন সমাজের সৃষ্টি হবে। কারণ, সমাজ থেকে হিংসা দূর করা হলে সকল প্রকার শোষণের অবসান হবে। প্রকৃতিগতভাবে অহিংসা অসদুপায়ে অর্জিত মুনাফা সংরক্ষণে কিংবা অনৈতিক কার্যেও সহায়ক হয় না। তাই এরূপ সমাজে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে সাম্যনীতি বাস্তবায়িত হবে এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে[১৫]। গান্ধী অহিংস পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাদের সচেতনতা সৃষ্টির কথাও বলেছেন। যেন সচেতন জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে শান্তি, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজেরাই উদ্যোগী হতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী পরাধীন ভারতবর্ষে সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি দ্বারা সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যে স্বনির্ভর গ্রাম হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম ধাপ। গ্রামগুলিতে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের এবং অহিংসার প্রতীক রূপে গান্ধী চরকাকে উপস্থাপন করেছেন। গান্ধীর কাছে চরকা ছিল অহিংসার অর্থনৈতিক অস্ত্র। গান্ধী বিশ্বাস করতেন চরকা ও হস্তচালীত তাঁতের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ভারতের আর্থিক ও নৈতিক পুনরুত্থান সম্ভব। চরকায় তৈরী খাদি সমগ্র রাষ্ট্রের স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বাধীনতার প্রতীক। গান্ধী মনে করতেন ব্রিটিশ মিলের তৈরী কাপড় ব্যবহার সহিংস অর্থনীতিকে সমর্থন করা। চরকা ঘোরানোও এক প্রকার সত্যাগ্রহ যেখানে কাউকে আঘাত না করেও সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়িয়ে দেয়া যায়। ভারতবর্ষের কৃষিজীবি যে বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বছরে কমপক্ষে চার মাস কর্মহীন অবস্থায় থাকে চরকা তাদের জন্য এবং দরিদ্র নারীদের জন্য একটি সম্মানজনক উপার্জনের উপায় হতে পারে। গান্ধীর মতে জনগণের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য এই কাজ অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। তিনি সকলকে প্রত্যহ চরকায় সুতা কাটার পরামর্শ দেন। যাদের অর্থাভাব আছে তারা মজুরীর জন্য সুতা কাটবে, যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে তারা উদাহরণ স্থাপনের জন্য এবং খদ্দরকে সস্তা করার জন্য যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে সুতা কাটবে। মহাত্মা গান্ধী মানুষের আত্মিক উন্নয়ন, অহিংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হিসাবে ৭টি "সামাজিক পাপ কে নির্দিষ্ট করেছেন, যথা: নীতিহীন রাজনীতি, নৈতিকতাবিহীন বাণিজ্য, শ্রমহীন সম্পদ, চরিত্রহীন শিক্ষা, মানবিকতাবিহীন বিজ্ঞান, বিবেকবর্জিত আনন্দ, ত্যাগহীন অর্চনা ইত্যাদি[১৬]।

গান্ধীর অহিংস নীতি এমন এক পদ্ধতি যেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাদের সচেতনতা সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে, যেন সচেতন জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে শান্তি, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজেরাই উদ্যোগী হতে পারে। এই সচেতন জনগোষ্ঠী স্বাবলম্বন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাও অর্জনে সক্ষম হবে। অহিংস নীতি বিবাদমান জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বন্দ্ব নিরসনের ও মানুষের স্বাভাবিক সদগুণাবলীর বিকাশ ও চর্চার পথ দেখায়। তাই মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বিশ্বব্যপী অস্থিরতা মোকাবেলা ও অশান্তি নিরসনে অহিংস নীতির চর্চা, প্রয়োগ ও বিস্তার ঘটানোর প্রয়োজন।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টে অহিংস নীতির প্রয়োগ

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত নোয়াখালী গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট বাংলাদেশে অহিংস নীতি প্রয়োগের একমাত্র সংস্থা। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের আর্থিক ও আত্মিক উভয় ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। প্রাথমিকভাবে ট্রাস্ট দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পূনর্বাসনের জন্য কাজ শুরু করে। অতঃপর সম্প্রদায়গুলির শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের বিষয়ে মোটিভেশনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমে তাই দাতব্য কর্মসূচির পাশাপাশি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মসূচি যুক্ত হয়।

বর্তমানে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট মহাত্মা গান্ধীর দর্শন ভিত্তিক যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- র‍্যালীর মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা তৈরী, অহিংস দর্শনের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করা, আলোচনার মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এসব কার্যক্রমকে জনগণের কাছে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান কিছু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেমন: শিক্ষা কার্যক্রম, ঋণদান কর্মসূচী, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ, ডেইরি ও মৎস্য চাষ, কাপড় রঙ করা ও বস্ত্রবয়ন, সেলাই ও সূচিকর্ম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট অহিংস নীতির প্রচারনায় শান্তি কর্মসূচী প্রকল্প পরিচালনা করছে। সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর শান্তিময় জীবন যাপন, মানবাধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে এই কর্মসূচী পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সালিশদারদের দ্বন্দ্ব মিমাংসার কৌশলগত পদ্ধতির উন্নয়ন, দ্বন্দ্বে জড়িত বাদী ও বিবাদী উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্পৃক্ত করে সকলের শান্তি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এই কর্মসূচীর আওতায় নোয়াখালীর জয়াগ ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে স্থানীয় সালিশদার, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় জনগণ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শান্তি, সম্প্রীতি ও অহিংসার গুরুত্ব তুলে ধরতে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ, মত বিনিময় সভা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় সালিশদারদেরকে এবং আগ্রহী পরিবারগুলোর সদস্যদের পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের স্থানীয় সালিশদার ও পরিবারের সদস্য জরিপ কার্যক্রম এবং স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার আগ্রহ বৃদ্ধি, আচরণগত পরিবর্তন, নিজেদের দ্বন্দ্ব নিরসনে সক্ষমতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির জন্য শান্তি ক্লাসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে শান্তি ক্লাস নেয়া হয়েছে সেখানে কিছু পাঠ্যসূচীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন: একসাথে অবস্থানরতদের পরস্পরকে জানা ও সবাই মিলে একত্রে কাজ করার পদ্ধতি শেখানো, প্রত্যেক ব্যক্তিই মূল্যবান তাই প্রত্যেকের নিজকে এবং অন্যকে মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা করতে শিখা, নিজের অনুভূতি ও অন্যের অনুভূতি সম্পর্কে অনুধাবনের চেষ্টা করা, রাগের উৎপত্তি ও প্রশমনের অর্থাৎ রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্পর্কে জানা, নিজের চাহিদা ও অন্যের চাহিদা বুঝতে পারা, পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্ব অনুধাবন, দ্বন্দ্ব সমাধানে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেন উভয় পক্ষ নিজেকে জয়ী মনে করে, শ্রবণ দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্থতার কৌশল এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা ইত্যাদি।

শান্তি প্রকল্প পরিচালনার ফলে লক্ষ্যভূক্ত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও অধিকার-কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংবেদনশীলতা তৈরী হয়েছে। সামাজিক ন্যায় বিচার

প্রাপ্তিতে দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির প্রবেশাধিকার তৈরী হয়েছে। জামানতের শর্ত ছাড়াই সালিশদারগণ আইন সম্মত পন্থায় মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিরসনে অবদান রাখছেন। বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সালিশদারগণের সালিশ এবং বিচার যোগ্য অপরাধের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। সালিশদারদের গতানুগতিক নিয়ম অনুযায়ী বিচার সালিশের মধ্যে কৌশলগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে তারা আলোচনার মাধ্যমে ২৭ হাজারের বেশী পারিবারিক সহিংসতা ও পারিবারিক বিরোধের মামলা মীমাংসা করেছে এবং অনেক নারীকে আইনি ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে শারীরিক শাস্তি বা বেত্রাঘাতের মাধ্যমে বিচারের রায় ইত্যাদির পরিবর্তন গ্রাম পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী, বউ-শ্বাশুড়ি ও প্রতিবেশিদের মধ্যে দোষারোপমূলক এবং অন্যায় আচরণের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ও বিস্তার হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধু সুলভ সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে । শিক্ষার্থী এবং প্রতিবেশী শিশুদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বেড়েছে। মাদ্রাসা পর্যায়ে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং বিনোদনমুখী কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ২০০৭ সাল থেকে প্রতিবছর গান্ধীর শান্তি, সম্প্রীতি ও অহিংসা প্রচারাভিযান কর্মসূচী পালন করছে। সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা, শান্তি ও সম্প্রীতির আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে তাদের শান্তিময় জীবনযাপন ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক সহানুভূতিশীল মনোভাব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্প পরিচালনা করা হয়। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এই কর্মসূচীর অধীনে শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও অহিংসার গুরুত্ব তুলে ধরতে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ, মত বিনিময় সভা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, জনসমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিশ্ব শান্তি দিবস, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস, মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও অহিংসা বিষয়ক র‍্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে ট্রাস্ট গান্ধীর আদর্শ চর্চার কর্মসূচী পরিচালনা করে। মাঝে মাঝে জাতীয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগীতারও আয়োজন করা হয়ে থাকে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট "সহিংসতা রুখবো, শান্তির দেশ গড়বো-আমার সাথে বাংলাদেশ" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০১৪ সাল থেকে দেশীয় ১৫টি এনজিওর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দেশব্যাপী শান্তি বিষয়ক জাতীয় প্রচারণা চালায়। সব ধরনের সহিংসতার বিপরীতে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকার, সকল রাজনৈতিক দল, আইনজীবি, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কৃষক, শ্রমিকসহ সকল শান্তিকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহবান জানানো হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে এই কার্যক্রম স্টপ ভায়োলেন্স কোয়ালিশনের (SVC) এর রূপ নেয়। বর্তমানে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট দেশব্যাপি তাদের শান্তি কার্যক্রম আরও জোরদার করেছে। পিটিআই এর রিপোর্ট অনুযায়ী, গান্ধী যে ৪৭টি গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন, সেখানে ১৯৪৬ সালের পর আর কোন দাঙ্গা হয়নি। যদিও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে দাঙ্গা হয়েছে। এটিই অহিংসা নীতির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য[১৭]।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ২০০০ সালে গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়াম নামে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে। মিউজিয়ামটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমাজের শান্তি, অহিংসা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষণীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট নিয়মিত গ্রুপ পর্যায়ে শান্তি সমাবেশ পরিচালনা করছে। মিউজিয়ামটি International Coalition of Historic Site Museums of Conscience এর সদস্য এবং এ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশব্যাপী "শান্তি যাত্রা (Peace Campaign)" কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে মিউজিয়ামটিতে বাংলাদেশের বৃহত্তম গান্ধী ভাস্কর্যের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২ অক্টোবর ২০২১ তারিখে সংস্কারকৃত জাদুঘরের উদ্বোধন করা হয়। প্রতিদিন শতাধিক দর্শনার্থী এই মিউজিয়াম পরিদর্শনে আসেন এবং গান্ধী দর্শন ও অহিংস নীতি সম্পর্কে অবগত হন। জানুয়ারি ২০২৬ থেকে জুন ২০২৬

পর্যন্ত সময়ে গান্ধী স্মৃতি জাদুঘরে দর্শনার্থী এসেছেন মোট ৪৮৬৩ জন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, সরকারি এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিও গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর দর্শনার্থী তালিকায় রয়েছেন। গান্ধীর দর্শন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করার লক্ষ্যে স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি প্রবেশের সুযোগ রয়েছে[১৮]।

মহাত্মা গান্ধীর কাছে চরকা ছিল অহিংসার অর্থনৈতিক অস্ত্র। মহাত্মা গান্ধীর চরকায় খাদি তৈরীর স্মৃতিকে অমর করে রাখতে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট হস্তচালিত তাঁত দিয়ে কাপড় বোনার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। এখানে পিওর খদ্দর উৎপাদনসহ হস্তচালিত তাঁতে তৈরি শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, থ্রীপিজ, পাঞ্জাবি, ফতুয়া তৈরী করা হয়। এখানে প্রাকৃতিক রঙের উপর গবেষণা করা হয়। ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক রঙের তিনশত শেড আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে উৎপাদিত পিওর খদ্দর এবং বিভিন্ন ডিজাইন ও প্রাকৃতিক রঙের কাপড় ব্যাপকভাবে ক্রেতা সমাদৃত হয়েছে। এই প্রকল্পে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট এর প্রধান ক্যাম্পাসে এবং ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার নতুন মুন্সির হাটে প্রায় ৩৫ জন নারী কর্মীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট বিভিন্ন সময়ে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত মেলায় খাদি ও তাঁত শিল্পের পণ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে এবং জাতীয় পর্যায়ে বাজার তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের নিজস্ব ক্যাম্পাসে গান্ধী মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গান্ধী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট নামক দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটিতে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গান্ধীর দর্শন অনুসরণ করা হয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ট্রাস্ট স্থানীয় যুব সমাজকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলায় ভূমিকা রাখছে। কারণ অহিংস মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তির জ্ঞান, সচেতনতা ও স্বনির্ভর হওয়া জরুরী।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এই শান্তি কর্মসূচী। বর্তমান পৃথিবীর অস্থিতিশীল সময়ে এই ধরনের কর্মসূচীর ব্যাপকতা বাড়ানো প্রয়োজন যেন সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তিতে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের গান্ধীর দর্শন ভিত্তিক কার্যক্রম নিয়ে অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

উপসংহার ও সুপারিশ

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি কেবল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক কৌশল ছিল না, এটি ছিল মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক সকল রিপু থেকে মুক্তির এক পরিপূর্ণ জীবনদর্শন। গান্ধীর অহিংস নীতি ভারত ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য অংশে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। মার্টিন লুথার কিং এবং নেলসন ম্যান্ডেলার মতো শান্তি ও স্বাধীনতার বৈশ্বিক প্রতীক এবং বর্ণবাদবিরোধী নেতারাও গান্ধীর অহিংস নীতি দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের কার্যক্রমের আলোচনা থেকেও এটাই প্রতীয়মান হয় যে অহিংস নীতি কেবল ইতিহাস নয় এটি বর্তমানেও কার্যকর। গান্ধী দর্শনের মূল ভিত্তি অহিংস নীতি সমগ্র বিশ্ববাসীর শান্তির জন্য। ব্যক্তির গণতান্ত্রিক চেতনা ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য বিবেক, আত্মশুদ্ধি, আত্মসমালোচনা ও প্রতিবাদ প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন প্রয়োজন। ব্যক্তি পর্যায়ে অহিংস নীতির চর্চা এই গুণাবলী বিকাশে সহায়ক হবে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট তার কর্মএলাকায় লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর আত্মিক উন্নতিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। ট্রাস্ট তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শান্তি কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

সুপারিশঃ

১. গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের কার্যক্রমকে জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে, যেন শান্তি কর্মসূচী সম্পর্কে সবাই অবগত হয় এবং অনুরূপ শান্তি কার্যক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অহিংস নীতির চর্চা শিক্ষার্থীদের আত্মিক উন্নতি ঘটাবে যা পরিবার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। তাই গান্ধীর অহিংসা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়কে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

২. ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, গান্ধীর চিঠি, চরকা ও আশ্রমের দুর্লভ ছবি নিয়ে একটি ডিজিটাল জাদুঘর তৈরী করা যেতে পারে। এতে জাদুঘর অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

৩. সালিশদারদের আলোচনার মাধ্যমে (২৭ হাজারটি) মামলা নিস্পত্তির মডেলটি সারাদেশের ইউনিয়ন পরিষদে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৪. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক বৈরিতা হ্রাসকল্পে গান্ধীর অহিংসা ও সহনশীলতার আদর্শকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক চর্চার অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

৫. গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টকে শুধু এনজিও নির্ভর না রেখে জেলা প্রশাসন এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সাথে যৌথ গবেষণা ও কর্মশালার আওতায় আনা যেতে পারে।

৬. অহিংসার অর্থনৈতিক অস্ত্র চরকাকে ভিত্তি করে আশ্রমের খাদি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে আরও অধিক সংখ্যক নারীর আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পরিশেষে, বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র নানাবিধ অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ও ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের মাঝে আক্রমণাত্মক আচরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সহিংসতার পাশাপাশি মৌখিক বাক্যবানে একে অপরকে আঘাত করছে। ব্যক্তি তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রায়শ কটু কথায় বা আক্রমণাত্মক কথায় এক অপরকে আঘাত করছে। এমন পরিবেশে বেড়ে উঠা শিশুরাও অসহিষ্ণু ও অসুস্থ মানসিকতায় বেড়ে উঠছে। এমতাবস্থায় অহিংস নীতির চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। অহিংস নীতি সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংঘাত এড়ানোর ও মানবিক অনুভূতি জাগ্রত করার কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চা নিশ্চিত করতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি তৈরীর জন্য পারিবারিক পর্যায় থেকে অহিংস নীতির চর্চা আবশ্যক। অহিংস পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি আত্ম-উন্নতির পাশাপাশি পরিবার ও রাষ্ট্রের উন্নতিতে সর্বোচ্চ সামর্থ্য প্রয়োগ করবে। বর্তমান বিশ্বের সহিংসতা, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, নানা রকম বৈষম্য এবং দারিদ্রের কবল থেকে মুক্তির জন্য গান্ধীর অহিংস নীতির চর্চা একটি পথ হতে পারে এবং গান্ধী আশ্রমের শান্তি চর্চা শুধূ নোয়াখালীর জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য বিকল্প মডেল হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী (References)

1. Baig, Tara Ali (1989), Gandhi: The Man of Action, Gandhi Marg, The Gandhi Peace Foundation, P: 687.
2. Chopra, P.N. (1979), India`s major non-violent movements 1919-1934: British secret reports on Indian peoples peaceful struggle for political liberation, VisionsBooks, New Delhi, India. P-54
3. Sansthakul, Monthly Newsletter of Gandhi Smarak Nidhi, March 2004, Vol.34, No.12, gandhiworld.in/english/gandhiashrambangladesh.php, 11.06.2013.

৪. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, বাংলাপিডিয়া, খন্ড-৩, পৃ: ১৬০।

5. Internet edition, www.banglapedia.org/HT/G_0016.HTM, 7.6.2013.

৬. গান্ধী আশ্রম (ট্রাস্টি বোর্ড) আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ১৫ নং আইন), গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ।

7. http://www.mkgandhi.org/museum/gat.htm 7/6/2013.
8. Datta, Dhirendra Mohan (1961), The Philosophy of Mahatma Gandhi, University of Wisconsin Press, USA, PP: 73-74.
9. Rai, Dr. Ajay Shanker (2000), Gandhian Satyagraha: An Analytical and Critical Approach, Concept Publishing Company, PP: 35-37.
10. http://www.mkgandhi.org/museum/gat.htm 7/6/2013
11. Sharp, Gene (1973), The Politics of Nonviolent Action- Porter Sargent Publishers, USA, PP: 64-67.
12. Saho, Kahnu Charan (1990), "The Psychology Behind Sarvodaya Thought", Gandhi Marg, The Journal of the Peace Foundation, Vol: 12, No-1, April-June.
13. Easwaran, Eknath (2008), Gandhi,The Man, Jaico Publishing House, India, P: 157.)
14. Gandhi, Mohandas K. (1968), Satyagraha in South-Africa, Navajivan Publishing House (editor & publisher), Ahmedabad, India. PP.89-90.

১৫. শামীম, জাকির (অনুদিত) (২০১৩), মহাত্মা গান্ধী রচনাবলী-৫ (সত্যের আহবান), নালন্দা প্রকাশন, ৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ১১২-৩০৯।

16. Internet Edition, (https://www.linkedin.com/pulse/seven-deadly-sins-per-mahatma-gandhi-principle-centered- 2015.
17. *https://theprint.in/india/noakhalis-gandhi-ashram-at-75-still-at-work-to-bring-peace-rural-development/1270180/*

১৮. নোয়াখালী গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট (২০২৬), অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি২০২৬-জুন২০২৬), সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।